এম. ভি. বিলাস ভ্রমণ
(নেপথ্যে সুন্দরবন ভ্রমণ)

জেসমিন পামি
প্রমিলা নজরুল

০১.

"সুন্দরবন সে যে মায়ের ই মতন

নিজ হাতে গড়েছে বিধাতা...."!

সুন্দরবনে সুন্দরীদের সাথে সাথে সহনশীল হৃদয়ের একজন সুন্দর আলী আংকেলের সাথে পরিচিত হওয়াটা আমাদের জন্য যতটা না কাকতালীয় তার চেয়েও বেশি সৌভাগ্যের। চাকরিকে শুধুমাত্র পেশা হিসেবে না নিয়ে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে বন বিভাগের একজন কর্মকর্তা হিসেবে বিগত ত্রিশ বছর কাটিয়ে দেওয়া এই সুন্দর মানুষটি আমাদের ৩দিনের সুন্দরবন ভ্রমণকে কতটা তথ্যবহুল, সহজ এবং নিরাপদ করেছেন তার বর্ণনায় আমি ঘটনাক্রমে আসছি..!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ৪৬ তম ব্যাচ আমরা। হোমো সেপিয়েন্সদের ৪৬ টা ক্রোমোজোমের সংখ্যার সাথে আমাদের ব্যাচের ক্রমিক মিলে যায় বলে ভালোবেসে আমরা এই ব্যাচের নাম দিয়েছি Chromosome-46

প্রথম বর্ষে পূরণ না হওয়া স্বপ্নগুলোকে পিছনে ছাটাই করে দ্বিতীয় বর্ষের প্রাণবন্ত চপলতায় অধীর হয়ে আমরা ছুটে চলার প্রত্যয় করেছি প্রকৃতি মাতার দেওয়া অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি, প্রকৃতির আদরের দুলালী, ছেয়ে থাকা সুন্দরীদের জন্মভূমি সুন্দরবনে। প্রাণিবিদ্যা পরিবারের ৪৬ তম ব্যাচের ৭৩ জন শিক্ষার্থীর (মেয়ে-৪৩, ছেলে-৩০) সুন্দরবন যাত্রায় অবিভাবকের দায়িত্বে স্নেহের পরশ নিয়ে যুক্ত হয়েছেন দুজন অতি প্রিয় সুদর্শন শিক্ষক। পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ ফরিদ আহসান স্যার এবং শ্রদ্ধেয় ডঃ মনজুরুল কিবরিয়া স্যার।

চট্টগ্রাম থেকে খুলনায় বাসযোগে যাত্রা করার জন্য ঠিক করা হলো "ঈগল পরিবহন" এর দুটি বাস।

বাস-১ চট্টগ্রাম শপিং কমপ্লেক্স থেকে এবং বাস-২ চবি ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার প্রাঙ্গন থেকে ছাড়ার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলো।

২০১৯ সালের ২রা নভেম্বর দুপুর ১টায় সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি উপস্থিত হলো যখন আমরা খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা করতে যাচ্ছি। অধীর আগ্রহে হুড়োহুড়ি করে বাসে উঠার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের ব্যাচের চবি ক্যাম্পাসে বসবাসকারীদের অপেক্ষার উন্মাদনায় তখন মুখর হয়ে উঠেছে শহীদ মিনার প্রাঙ্গন। আগের দিন রাতে আমরা অনেকেই ঘুমাতে পারিনি কিন্তু তাও এই উন্মাদনার স্রোতে কারোর ই ক্লান্তি আসছে না। বাস ছাড়ার সময় হলো দুপুর ২টা। এই ১ঘন্টা সময়ের মধ্যেই একজন একজন করে আসছিলো আর আমরা তাকে এমনভাবে অভিবাদন জানাচ্ছিলাম যেন সবাই মিলে রাজ্য জয় করতে যাচ্ছি।

আমরা যাচ্ছি বিশ্বের সবচেয়ে বড় Mangrove forest, ১৯৯৭ সালে UNESCO ঘোষিত World Heritage Site, রামসার জলাভূমি এবং Bengal tiger

(পুরনো নাম Royal Bengal tiger - ফরিদ স্যার) এর বিচরণভূমি সুন্দরবনে।

একটি সূত্র থেকে জানা যায় Heritiera fomes

(সুন্দরী গাছ) নামক একটি উদ্ভিদ এই বনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে এই বনের নাম সুন্দরবন। সুন্দরী গাছ থেকে পাওয়া যায় শক্ত, মজবুত কাঠ যা নৌকা এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরির কাজে লাগে।

একটি ডকুমেন্টারিতে দেখা তথ্য মতে সুন্দরবনের আদিনাম 'বাদাবন'। তবে এমন নাম কেন দেওয়া হলো তার কোনো ব্যখ্যা পাওয়া যায়নি।

নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন রকম কথা প্রচলিত থাকলেও সবাই এই ব্যাপারে একমত হবেন যে প্রকৃতির বর্ণিল-যৌবন আর রূপ-লাবণ্যের পসরা বিলিয়ে বসে আছে এই বন তাই তার নাম সুন্দরবন। সুন্দরবনে উপস্থিত হতেই সবার মনে দোলায়িত হবে রবী ঠাকুরের সেই চরণ কয়টি--

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কত আপনি

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী-

ওগো মা তোমাই দেখে দেখে আঁখি না ফেরে..."

মুঘল আমলে স্থানীয় এক রাজা পুরো সুন্দরবনের ইজারা নিয়েছিলেন। তবে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের কাছ থেকে এই বনের স্বত্বাধিকার নেন এবং তখন ই পুরো সুন্দরবনের মানচিত্র তৈরি করা হয়

(করমজল এবং হিরণপয়েন্ট এ আমরা সুন্দরবনের মানচিত্র দেখেছি).

০২.

বাসের জানালা দিয়ে ঘুমুঘুমু চোখে ৩রা নভেম্বরের সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য আমাদের কারো কারো হয়েছিলো। আর বাকিরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলো ক্লান্তির কারণে। যাত্রাপথের বিরতিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগেরদিন রাতের খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমাদের সবার(সেটাও আরেক রোমাঞ্চকর অনুভূতি)। তাই সবার ক্লান্তিটা একটু বেশি ই ছিলো।

খুলনা পৌঁছে কোনো নির্দেশনা না পেয়ে ভুলক্রমে বাস থেমে গেলো খুলনা রেল স্টেশনে। তখন ই আমাদের বাস-২ থেকে হুট করে নেমে পড়লো আমাদের ব্যাচের অন্যতম উৎসাহী প্রাণিবিদ এবং একমাত্র লেপিডোপটেরিস্ট জহির চট্টগ্রাম শহরের দূষিত বাতাস নিতে নিতে সে এতটাই তিক্ত ছিলো যে কোনো নির্দেশনার জন্য সবুর করতে পারছিলো না। খুলনার ফুরফুরে বাতাসে নিজের ফুসফুস ভর্তি করার উন্মাদনা তাকে পাগল করে তুললো।

বাস ঘুরিয়ে ৪নম্বর লঞ্চঘাটে (আমাদের সাথে থাকা প্রধান গাইড হানিফ ভাইয়ের দেয়া তথ্য মতে এই ঘাটের অপর নাম শিকদার ঘাট) যেতেই আমি যখন "জহির নেমেছে" বলে জোরে হাঁক দিয়ে উঠলাম তখন শ্রদ্ধেয় ফরিদ স্যার আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে রেল স্টেশন থেকে লঞ্চঘাট বেশি দূরে নয়, বরিশালের ছেলে জহির তা চিনবে।।

আসলেই খুব বেশি দূর ছিলো না। বাস একটু ঘুরে চলতেই আমরা পৌঁছে গেলাম ৪ নম্বর লঞ্চ ঘাটে। আমাদের পরপর ই এসে পৌঁছালো বাস-১।

সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজানা এক জায়গায় জড়োসড়ো হয়ে আমরা প্রাণিবিদ্যা পরিবার দাঁড়িয়ে আছি। সকালবেলার স্নিগ্ধ পরিবেশ, মৃদু-মৃদু হাওয়া।

রোমাঞ্চ, থ্রিল, আশঙ্কা সবকিছুই একটু একটু করে উপভোগ করছি আমাদের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে।

সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন "Royal Vision Tourism " এর ৫ জন গাইড। আপাত দৃষ্টিতে দেখতে খাটো, স্বাস্থ্যবান, ফরসা, চেক শার্ট পরিহিত এক যুবক স্পষ্ট কন্ঠে নিজেকে আমাদের কাছে "হানিফ ভাই" বলে পরিচয় দিলেন। তিনি নিজেই একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন ইয়া লম্বা গোঁফেের আল আমিন, সাব্বির , সূজন এবং আরিফ নামের বাকি ৪জন গাইডের সাথে। তাদের ভাই বলে ডাকার জন্যও নির্দেশনা দিয়ে দিলেন। এমন অনাড়ম্বর সৌজন্যমূলক নির্দেশনা দেবার সময় আমরা কেউ ই জানতাম না ওনারা কতটা অমায়িক, বন্ধুবৎসল, বিনয়ী এবং নিয়মানুবর্তী। ওনাদের নির্দেশনা এবং সাহায্য ভ্রমণের প্রতি মূর্হুতে আমাদের জন্য অনেক সহায়ক ছিলো।

ভৈরব এর তীরে আরো কয়েকটি জাহাজের সাথে ৪ নম্বর লঞ্চ টার্মিনাল তথা শিকদার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে তিন তলা বিশিষ্ট "এম. ভি. বিলাস ভ্রমণ" নামক সুদর্শনা জাহাজটি। সময় তখন সকাল ৬ঃ৩০। জাহাজে উঠার নির্দেশনা পেতেই উৎসাহী বেগে আমরা মেয়েরা "লেডিস_ফার্স্ট" নীতি অনুসরণ করে আগে আগে উঠতে লাগলাম। হানিফ ভাই মেয়েদের বলে দিলেন দ্বিতীয় তলায় উঠে নিজেদের পছন্দের কেবিন বেছে নিয়ে ঢুকে যেতে।। তখনও আমরা জানতাম না আগামী তিনদিন আমরা এই জাহাজেই থাকতে যাচ্ছি; থাকা, খাওয়া, ঘুমানো, প্রাকৃতিক কাজ সারা সব-ই এই জাহাজেই করতে যাচ্ছি।

লোহার মজবুত সিড়ি দিয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠেই আমি একটা দুজনার কেবিনে (রুম নং- ২১৭) ঢুকে গেলাম আর আমার রুমমেট হয়েছে আমার অতি প্রিয় স্বল্পভাষী সহপাঠী তামান্না।

আমাদের পাশের কেবিনে তখন জায়গা করে নিয়েছিলো তুহিন এবং শিফা

এভাবেই দ্বিতীয় তলার প্রত্যেকটি রুমে মেয়েরা যার যার পছন্দ মত কেবিন এবং রুমমেট বেছে নেয়।

কেবিনের পরিষ্কার শুভ্র চাদরের বেডে শুয়েই যখন আমি সকালবেলার দূষণমুক্ত আসমানী আকাশের সাথে বিস্তৃত নীল জলরাশির মিতালি দেখতে পেলাম তখন আমার মনে মনে দোলা দিয়ে গেলো রবী ঠাকুরের বিখ্যাত একটি কবিতা--

" নমঃ নমঃ সুন্দরী মমঃ

জননী, জন্মভূমি-

গঙ্গার তীর(আসলে ভৈরবের তীর), স্নিগ্ধ সমীর,

জীবন জুড়ালে তুমি!"

বিস্তৃত জলরাশির সৌন্দর্যে আমি এতই বিভোর ছিলাম যে খেয়াল করতে ভুলে গেলাম আমাদের কেবিনটার পাশেই রয়েছে চার - চারটা বাথরুম!

(যেটা খুব দরকারি ছিলো এই জলভ্রমণে)

০৩.

"পেট শান্তি তো দুনিয়া শান্তি"- এই নীতিতে অন্যান্য জাতি কতটুকু বিশ্বাসী তা ঠিক জানিনা; কিন্তু আমরা ভোজনরসিক বাঙালী জাতি কায়মনোবাক্যে এই নীতিতে বিশ্বাসী সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি।

সকাল-৮ঃ০০টা। মেয়েরা যে যতটুকু পারি ততটুকু গুছিয়ে নিয়ে (মানে সাজ-গোজ করে) সমবেত হয়েছি জাহাজের নিচ তলার ডাইনিং এ। নারী জাতির অগ্রগামিতাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিতেই প্রথমে সকালের নাস্তা করার জন্য সব মেয়েকে সুযোগ দেয়া হয়েছে। নিচ তলার ডাইনিং এ ছেলে-মেয়ে ৭৩ জন একত্রে বসবার মত জায়গা ছিলো না বলেই এই ব্যবস্থা।

হানিফ ভাই শুরুতেই ঘোষনা দিলেন আগামী তিনদিন জাহাজ কে যেন নিজের বাড়ি মনে করেই উদরপূর্তি করা হয়। কারো কোনো সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ সব ব্যাপারেই যেন ওনার সাহায্য চাওয়া হয়।।

পরবর্তীতে ওনি চমৎকারে ভাবেই ওনার কথা রেখেছিলেন

আমরা সবাই জাহাজে উঠার পরপর ই জাহাজ চলা শুরু করেছিলো। ভৈরব ছেড়ে আমরা এখন পশুর নদীতে চলে এসেছি। সকাল ১০টা বাজতেই সোনা-মাখা রোদ্দুরে ঝলমল করছিলো আকাশ। আকাশের এই অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি জাহাজের ছাদ থেকে যেখানে স্যারদের সাথে আমরাও বসে আছি যার যার অবস্থানে। কিবরিয়া স্যার হাতের ইশারায় আমাদেরকে একটু দূরের রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেখিয়ে দিলেন।

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাগেরহাটের রামপালে অবস্থিত। সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কি.মি. উত্তরে পশুর নদীর তীরে অবস্থিত কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এটি। এই কেন্দ্রটি নির্মিত হচ্ছে বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী দেশ ভারতের যৌথ উদ্যোগে (BPDB এবং NTPC)।

১৮৩৪ একর জমির সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে এই কেন্দ্রের জন্য। এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেই কিবরিয়া স্যার বলে উঠলেন-

" 'রামসার কনভেনশনে' দেয়া পরিবেশ রক্ষার তথ্য অনুসারে এরকম প্রকল্প বন থেকে ২৫ কি.মি দূরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হলেও রামপাল প্রকল্পে তা মানা হচ্ছে না এবং এটি অচিরেই সুন্দরবনকে ধ্বংস করতে পারে।"

নদীপথে এম.ভি.বিলাস ভ্রমণে করে আরো কিছুদূর যেতেই আমরা BCG (বাংলাদেশের উপকূল রক্ষক) এর বিশাল একটি জাহাজ দেখতে পেলাম। বাংলাদেশের সামুদ্রিক তটরেখার নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাটি ১৯৯৫ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এই সংস্থার অধীনে ৫৭ টি জাহাজ এবং ৩৩৩৯ জন কর্মী রয়েছে।

বাগেরহাটের নির্মল হাওয়া, চারদিকে অথৈ জলের ঢেউ, আকাশে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা Brahmyni kite এর দল আর জাহাজের ত্রিপল দেওয়া ছাদ জুড়ে বসে আছি আমরা প্রাণিবিদ্যা পরিবার তথা ক্রোমোজোম-৪৬ এবং শ্রদ্ধেয় দুজন স্যার। মূহুর্তটির কথা ভাবতেই মন চায়ছে আবারো ছুটে যেতে সেখানে!

একটু একটু করে আর কতদূর যেতেই অতিক্রম করলাম মোংলা সমুদ্র বন্দর। বাগেরহাটে অবস্থিত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর হলো মোংলা। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত বন্দরটি খুলনা থেকে ৪৮ কি.মি দূরে অবস্থিত। পশুর এবং মোংলা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত এই বন্দরটি শুরুর দিকে "চালনা বন্দর " নামে পরিচিত ছিলো। পণ্য পরিবহনের জন্য ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকে এটি।

সকাল-১১ঃ০০ টা। আমরা চলে এসেছি আমাদের প্রথম স্পট "করমজল" এর কাছাকাছি। সকাল থেকে এখন অবধি আমরা কেউ ই খেয়াল করলাম না যে আমাদের জাহাজের সাথে একটা বিশাল ট্রলার বাঁধা রযেছে যেটাতে অনায়াসেই ৮০ জন সংকুলান হবার মত জায়গা আছে। এই ট্রলারটাতে বসেই আমরা আজীবন গ্যালারিতে রাখার মত কিছু সেলফি তুলেছি কিবরিয়া স্যারের ক্লিকে!

ট্রলার চালানোর দায়িত্বে আছেন গায়ে সাদা পাঞ্জাবি আর মাথায় সাদা টুপি পরা একজন ভদ্রলোক। বয়স ৩০-৩৫ এর মত। হালকা- পাতলা গড়নের। মুখে মিষ্টি হাসি। ওনার কথা বলার টোন টা একটু অন্য রকম থাকলেও বেশ আকর্ষণীয় ছিলো। চলার পথে সুযোগ পেলেই ওনি আমাদের অনেক ছোটো-খাটো গল্প শুনিয়েছিলেন।

"করমজল ইকো ট্যুরিজম সেন্টার" বাগেরহাট জেলার চাঁদপাই রেঞ্জ এ অবস্থিত। সুন্দরবনে আমাদের পরিদর্শন করা একমাত্র স্পট এটি যেটাতে আমরা প্রাণিবিদ্যা পরিবার ছাড়াও আরো অনেক দর্শনার্থী উপস্থিত ছিলো। 'করমজল' নামকরণ এর কারণ আমি জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু কোনো তথ্য পাইনি।।

০৪.

শ্রদ্ধেয় ফরিদ স্যারের ভাষ্যমতে করমজলেই সর্বপ্রথম লোনা পানির কুমিরের প্রজনন শুরু হয়। তবে জায়গাটিতে প্রচুর পরিমাণ রেসাস বানর

(Macaca mulatta) রয়েছে। এদেরকে যদি কোনোভাবে বিরক্ত করা হয় তবে এরা আক্রমণ করতে পারে। আগের বছর আমাদের সিনিয়র ব্যাচের দুই আপুর ব্যাগ টেনে নিয়ে গিয়েছিলো এরা, তাই কিবরিয়া স্যার আমাদের আগাম সতর্ক করে দিলেন।

করমজলে ঢুকতেই বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত একরাশ নির্দেশনা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন শ্রদ্ধেয় আজাদ কবির, বনবিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা।

বন্য প্রাণীর সংখ্যা বিষয়ক কয়েকটি তালিকা করমজলের প্রবেশপথসহ অন্যান্য পাশে দেয়া ছিলো যদিও। তার মধ্যে একটি তালিকায় দেওয়া আছে ২০১৮ এর হিসাব মতে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪টি, হরিণের সংখ্যা এক লক্ষ - দেড় লক্ষ, বানরের সংখ্যা ৪০ হাজার - ৫০ হাজার, কুমির ১৫০-২০০ এবং বন্য শুকর আছে ২০-২৫ টি।

করমজলের প্রবেশদ্বারে নুড়ি পাথরের মত উপাদান দিয়ে বানানো সুন্দরবনের মানচিত্রটি আমাদের সবার নজর কেড়েছে। মানচিত্রটিকে সুন্দর গড়নের একটা স্বচ্ছ কাচের বাক্স দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিলো, যাতে দর্শনার্থীরা অসাবধাতাবশতঃ কোনো ক্ষতি না করে বসে। (করমজলে কিন্তু প্রায় সকল দর্শনার্থীদের ই প্রবেশ করার অনুমতি আছে)।

এছাড়াও ঐ বাক্সের ভেতর বাচ্চা (পুরুষ) বাঘের পায়ের ছাপ এবং স্ত্রী বাঘের পায়ের ছাপ সম্বলিত মাটির ঢেলা, বাঘের নখ, গোলফল, কুমিরের ডিম, কচ্ছপের ডিম ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো সবার দেখার সুবিধার জন্য। শ্রদ্ধেয় আজাদ কবির সবকিছুর ই আলাদা করে বর্ণনা দিলেন এবং শেষমেষ ওনার একটা গবেষণাপত্র স্যারদের হাতে তুলে দিয়ে সবার সাথে ফ্রেমবন্দী হলেন।

কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটানো অসংখ্য ছোট-বড়-মাঝারি আকারের কুমির (Crocodylus porosus) করমজলের একপাশের খাঁচাতে দেখছিলাম আর একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম ছবি তোলার প্রতিযোগীতায়।

অন্যদিকে, চারপাশ ঘেরাও করে দেয়া খোলা জায়গায় চড়ে বেড়াচ্ছিলো মায়া মায়া চাহনির চিত্রা হরিণেরা (Axis axis)। এদেররকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেলফিতে জায়গা দেওয়ানোর জন্য জোরদার চেষ্টা স্বরূপ সামনের মাঠ থেকে সবুজ ঘাস তুলে এনে খাওয়াতে চাচ্ছিলো আমাদের গরম সিআর মুরাদ, তার সাথে যোগ দিয়েছে চ্যাম্পিয়ন পক্ষীবিদ নাঈম।

গাইড হানিফ ভাই একপাশে খেজুর গাছের মতো চিকন চিকন পাতার ঝোপসমেত একরকম গাছ দেখালেন আমাদের যেটা শুধু সুন্দরবনেই হয়। গাছগুলোর নাম হেঁতাল (অনেকে হেন্দালও বলে থাকেন)! গাছগুলো ঝোপের মত বলে বাঘ মামারা খুব সহজেই লুকোতে পারে এদের ভেতরে। করমজল ছাড়াও টাইগার পয়েন্ট এবং কটকা অভয়ারণ্যেও এসব গাছ দেখেছি আমরা।

করমজলের আরেকটি আকর্ষণ ছিলো কৃত্রিম ডলফিনদের সাথে এবং ডলফিনদের কঙ্কালের সাথে পরিচিত হওয়া। ডলফিনদের নিয়ে বিশেষ করে "ইরাবতী ডলফিন" সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দেয়া ছিলো ছাউনিযুক্ত ঐ সুন্দর জায়গাটায়। ছবির নিচে নিচে সাজানো ছিলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো।

ইশশশ! ডাশা ডাশা কাঁচা পেয়ারা মাখা খাচ্ছিলাম আর চাঁদ মামার বলা কথাটা স্মরণ করছিলাম বারবার।

সময় দুপুর- ১২ঃ৩০। সবাই করমজল থেকে ফিরে এসে এম. ভি. বিলাসের ছাদে বসেছি। প্রামাণ্যচিত্র দেখা, স্যারদের কথা শোনা, নিজেদের কথা বর্ণনা করা এসব ই ছিলো আমাদের একত্রিত হবার উদ্দেশ্য।

"জাহাজে খাবারের তালিকা যত বড় বাথরুমের আকার তত ছোট"---এটাই ছিলো আলোচনার সময় চাঁদ মামার বলা কথা!

আমাদের ৩দিনের খাবারের তালিকা আর জাহাজের বাথরুম দেখলে যে কেউ চাঁদ মামার কথা বিনা বাক্যে স্বীকার করতো!!

বিকাল- ৩ঃ০০টা। ট্রলারযোগে আরেকটি স্পটে এসে গেছি সবাই। " হাড়বাড়িয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক" ট্রলার থেকে নামার আগেই আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা দিলেন সুন্দর আলী আংকেল। এখানেই ওনার সক্রিয় উপস্থিতি আমাদের নজরে পড়ে! ওনার

নির্দেশনায় এমন কিছু ছিলো যা পরবর্তীতে ওনার সাথে সহজভাবে মিশতে এবং ওনাকে ছোট-বড় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলো।

০৫.

হরিণদের অতি প্রিয় খাদ্য কেওড়া গাছের পাতা (Sonneratia mangrove)। বিস্তীর্ণ কটকা অভয়ারণ্যে ছড়িয়ে আছে এসব লম্বা লম্বা গাছ। আরো লক্ষ্য করলে মনে হবে গাছগুলোর নিচের দিকের পাতা গুলো খুব সমান করে যেনো নিড়ানি দিয়ে ছাঁটা! চিত্রা হরিণের খাদ্য এসব পাতা, তাদের নাগালের মধ্যে যত পাতা থাকে তারা তা এভাবেই খেয়ে শেষ করে। এই গাছের পাতা ধরা বারণ ছিলো আমাদের জন্য।

আরো একটি গাছের পাতা ধরতে বারণ করে দিয়েছিলেন সুন্দর আলী আংকেল। সেটা হলো গেওয়া গাছ (Excoecaria agallocha) ১টি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ, Euphorbiaceae পরিবারের সদস্য। গাছটি সোজাসুজিভাবে জন্মায় এবং লম্বা হয়।

কাঠের তৈরি লম্বা মাচা দিয়ে প্রাণিবিদ্যা পরিবার সারি বেঁধে হাঁটার সময় মটমট শব্দ করলেও মাচার নিচের মাটিতে কিলবিল কিলবিল করে হাঁটছিলো অসংখ্য লাল কাঁকড়া (Fiddler crab)। এরা আমাদের একত্রে দেখে হয়তো আরো বেশি উৎসাহী হয়ে নিজেদেরকে দেখাচ্ছিলো।

সুন্দরবনে প্রায় ১২ প্রজাতির ক্রাস্টাশীয়ান রয়েছে। এদের মধ্যে Fiddler crab, Mud crab ইত্যাদি অন্যতম। Fiddler crab দের বৈশিষ্ট্য হলো এদের একটি মাত্র কিলেট (চিলেট) লেগ থাকে যেটা তারা তাদের গর্তের বাহিরে বের করে রাখে শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য।

কাঁটার মত দেখতে এমন কিছু গাছের দিকে নির্দেশ করে হানিফ ভাই বললেন -"এরা হলো সুন্দরবনের স্থানীয় কাঁটা। যেখানে নোনা পানির জোয়ার-ভাটা হয় সেখানেই জন্মায় এরা।" সাধারণ নাম হারগোজা (Dillenia pentagyna)

সফেদা নামক ফলটি প্রচুর পরিমাণ খনিজ লবণ এবং

Vitamin - A, C সমৃদ্ধ। এছাড়াও এই ফলের শরবত জ্বরনাশক এবং খোসা রক্তনালি দৃঢ় করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। আমাদের কিংবদন্তী ফটোগ্রাফার রূপান্তর তথা রূপা আমাকে হাড়বাড়িয়াতে সফেদা গাছ চিনিয়েছিলো যেটা আমি আগে চিনতাম নাহ!

Tiger দের ডোরাকাটা দাগের সাথে মিল আছে বলে Fern গুলোর নাম টাইগার ফার্ন

(Nephrolepis exaltata) যার Family- Polypodiaceae। বিশেষ কোনো যত্ন ছাড়াই জন্মাতে পারে এই টেরিডোফাইটরা। হাড়বাড়িয়াতে গেলে অসংখ্য টাইগার ফার্নের দেখা মিলবে দর্শনার্থীদের।

প্রথমদিন করমজল ও হাড়বাড়িয়া পরিদর্শন শেষ করে আমরা ট্রলারে করে আবার ফিরে এসেছি জাহাজে। সন্ধ্যা-৭ঃ০০টা। সবাই আবার জাহাজের তৃতীয় তলায় স্যারদের সাথে সমবেত হলাম। সবাই সবার অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং পাগলা বিজ্ঞানীর Jahir এর বানানো ভিডিও স্লাইড দেখা শেষ করে ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও মেতে উঠলাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগের মজায়।

সব আনন্দের উৎস ছিলো একটা খেলাকে কেন্দ্র করে যেটা খেলবার নিয়ম ছিলো,জোড়ায় জোড়ায়। প্রথমে জোড়ার ১জন বিনা শব্দে ১টা গানের লাইন অভিনয় করে দেখাবে, এরপর জোড়ার অন্য জনকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুঝে বলতে হবে কোন গান দেখানো হলো। খেলায় অংশ নেওয়া জোড়াগুলোর চালাকি ধরে ফেলার দায়িত্বে আছে বাকি দর্শকরা! স্বয়ং দুইজন স্যারও জুটি বেঁধে এই খেলায় অংশ নিলেন আর প্রথম পুরষ্কার জিতে নিলেন।

তবুও আরমান মামার সাথে তার পার্টনার,

ফাইজা আপুর সাথে তার পার্টনার,

শুভ ভাইয়ার সাথে তার পার্টনারের

অভিনয় শৈলী এবং গেস করার দক্ষতা(!) দেখে সবাই হেসে কুটিকুটি হচ্ছিলো। এতটাই মজা করছিলাম সবাই সেই রাতে।

** **

বাথরুমের সামনে মেয়েদের লম্বা লাইন দেখে আমার পাকস্থলী যেন নিজেকে এন্টি-ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে আনলো। একটু পরেই বের হতে হবে দ্বিতীয় দিনের ফিল্ড-ট্যুরের জন্য। আর এখন বেসিনের সামনে সাজুগুজু করতে থাকা আমার সহপাঠিনীদের দেখে আমার পাকস্থলী বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে!

৪ঠা নভেম্বর।

ভোর- ৪ঃ০০টা পার হলো। কোনোভাবে প্রাকৃতিক কর্ম সেরে নিয়ে একটু পরেই আমরা বের হয়ে গেলাম।

সূর্য্যিমামা উঠি উঠি করছিলো আর হয়ত আমাদের কটাক্ষ করছিলো এই বলে যে- "বাছারা, বাঘের দেখা ত পাবে না, আমাকে উদিত হতে দেখেই গায়ে জোশ আনো! ভোরবেলায় নিদ্রাভঙ্গ করো না বলেই তোমাদের সাথে খোশমেজাজে দেখা করার সুযোগ হয় না। আজ নাহয় প্রাণভরে সূর্যোদয় দেখো।"

০৬.

"A sleeping beauty emerging from mists and water" ৭ম শতাব্দীতে বাংলার আকাশে সূর্যোদয়ের অপার সৌন্দর্য দেখে এই মন্তব্য করেছিলেন বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েং সাং।

ট্রলারে বসে একদম ভোরবেলায় নদীতে ভেসে যেতে যেতে নির্মল বাতাসের সুরভি গায়ে মেখে বারবার হিউয়েং সাং এর বলা কথাটার সার্থকতার প্রমাণ পাচ্ছিলাম।।

মৃদু-মৃদু নির্মল বাতাসের হাওয়ায়,

আলো-আঁধারির খেলায়, সূর্যের ছড়িয়ে পড়ার মায়ায় পুলকিত হচ্ছিলাম আমরা সকলে!

নদীর তীরে তীরে তখনি খাদ্য শিকারের মিশনে নেমেছিলো শুভ্র সারস পাখিরা। "সারস" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত "শরহংস" থেকে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসনের সময় ব্রিটিশ সৈন্যরা এই পাখিগুলোকে নির্বিচারে শিকার করতো। লম্বা গলা, লম্বা পা ওয়ালা এই পাখিরা Gruiformes বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এদের বলা হয় পাতি সারস বা Common Crane.

সকাল - ৬ঃ২০। আমরা পৌঁছে গেলাম পূর্ব নির্ধারিত গন্তব্যে। ট্রলার থেকে নেমে শুরুতেই আমরা দর্শন পেলাম তিন তলা বিশিষ্ট কটকা ওয়াচ টাওয়ার বা জামতলা ওয়াচ টাওয়ারের। অনিন্দ্য সুন্দর এই টাওয়ারটির উপরে দাঁড়িয়ে দেখা যায় সুন্দরবনের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য। সুনসান নীরবতার মাঝে যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা হয় তাহলে হয়তো বাঘ মামার ক্ষণিক দেখা মিলতেও পারে। এক সাথে আট জনের বেশি উঠা নিষেধ

ছিলো কাঠের টাওয়ার টাই। সৌভাগ্যবশত আমিও সুযোগ পেলাম উপরে উঠার। আহ্! আবার মুগ্ধ হলাম! প্রকৃতি মাতার অপূর্ব লাস্যময়ী সৌন্দর্যের লীলা দেখে!

কটকা টাওয়ার সুন্দরবন পূর্ব বনবিভাগের বাগেরহাট জেলার শরণখোলা রেঞ্জে অবস্থিত। কটকা টাওয়ার দেখা শেষ করে আমরা আরেকটু সামনে এগোতেই পেয়ে গেলাম একটা পুকুর।। মিঠা পানির এই পুকুরটি নামকরণ করা হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের নামে। সুন্দরবনের নোনা পানির এই এলাকার মধ্যে একমাত্র মিঠা পানির পুকুর এটি। পুকুরের পিছনের অংশে কিছু একটা দেখে ফরিদ স্যার ইশারা করতেই আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। স্যার একটা পাখি দেখালেন।

পাখিটির নাম মদনটাক। ইংরেজি নাম Lesser Adjutant। দেশের বিলুপ্তপ্রায় পাখিগুলোর মধ্যে একটি। লম্বা ঠোঁটের বিশালদেহী পাখিটার বড় মদনটাক নামক একটা প্রজাতি রয়েছে যেটার ওজন প্রায় ৬ কেজি হতে পারে!

'দলছুট 'ব্যান্ডের নামের মত আমরাও হাঁটতে গিয়ে বারবার দলছুট হয়ে যাচ্ছিলাম। একদল এগিয়ে যাচ্ছে তো, এক দল পিছিয়ে, এক দল মাঝামাঝি! কটকার বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকার জামতলা পার হতেই চোখে পড়লো বিশাল এক ময়লার স্তূপ! চিপস,কেক, বিস্কুটের প্যাকেটসহ বিভিন্ন কোল্ড ড্রিংকসের ক্যান ফেলে রেখে স্তূপ করা হয়েছে এত সুন্দর, সবুজ বনের মধ্যে! এসব নন-ডিগ্রেডেবল জিনিস পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা জানা সত্ত্বেও হয়তো কোনো পরিদর্শনকারী দল এসব ফেলে রেখেছে। আমরা কতটা সচেতন তা এই সুন্দরবনে এসেও প্রমাণ রেখে যাচ্ছি আমরা! আহা! বাঙালী…!!

লাইন ধরে আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে আমি এসে পড়েছি স্বল্পভাষী ছেলে শুভ'র পাশের লাইনে। গাছ পালার মূলের ভেতর বড় বড় সাদা ডিমের ভেতর কিছু একটা দেখেই ও আমাকে দেখালো সেগুলো। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে কাছ থেকে দেখতেই বুঝতে পারলাম এগুলো জোয়ারের পানিতে ভেসে আসা কিছু প্লাস্টিকের বলের মত উপাদান যা মাছ ধরার জালে ব্যবহার করা হয়! এসব গাছপালার ফাঁকে এমনভাবে পড়েছিলো যেখানে সূর্যের আলো যায় না। শুভ ওসব নিয়ে কথা বলছিলো আর আমি ওর পায়ের কাছে পায়জামায় ফুটে থাকা সহস্র কাঁটা দেখছিলাম!

" বলছো তুমি যাওনি কোথা

তবে জামায় কেন চোরকাঁটা?"

ইহতিশাম আহমেদের কবিতার লাইন দুটো মনে পড়ে যেতেই হাসি পেয়ে গেলো আমার!

প্রেমকাঁটা বা চোরকাঁটা (Andropogon aciculatus), স্প্যানিশ ভাষায় যার নাম Dry Love। এক ধরনের ঘন পাতাযুক্ত ঘাস এরা। এদের আঞ্চলিক নাম "ভাটুই"। আমাদের সবার পাজামাতে প্রেমকাঁটা ভর্তি হয়ে গেলেও সবচেয়ে বেশি কাটাঁ লেগেছিলো শুভ,নূপুর আর ফারজানার পাজামায়। সেটা খেয়াল করতেই কিবরিয়া স্যার তাদের পাগুলো একত্র করে প্রেমকাঁটাদের ক্যামেরাবন্দি করে নিলেন। আমার পাজামায় কাঠাঁলের আঠার মতো লেগে থাকা কাঁটাগুলো এখনো পরিষ্কার করা হয়নি!

....

এম.ভি. বিলাস ভ্রমণ (নেপথ্যে সুন্দরবন)

#পর্ব_০৭-১১

ঘন্টায় ২১৫কি.মি. গতিবেগের "সিডর" সুন্দরবনে আঘাত হেনেছিলো ২০০৭ সালের ১৬ই নভেম্বর। কটকা অঞ্চলে এখনো ছড়িয়ে -ছিটিয়ে আছে শুকনো গাছপালার ধ্বংসস্তূপ। USD এর তথ্যমতে এই সিডরে ক্ষতির পরিমান 1.7 বিলিয়ন ডলার। আহত হবার মত খবরটি হলো সিডরটি সুন্দরবনের বনাঞ্চলের যে ক্ষতি করে তা পূরণ হতে সময় লাগবে প্রায় ৪০ বছর! ২০০৭ সালে হওয়া ধ্বংসযজ্ঞের তান্ডব চিত্র ২০১৯-এ ও বর্তমান দেখে আমরা আরো একবার প্রমাণের সাথে বুঝতে পারলাম বাংলাদেশের ফুসফুস এই সুন্দরবন কতটা জরুরি আমাদের টিকিয়ে রাখতে!

ছড়ানো-ছিটানো শুকনো গাছ-পাতার স্তূপ মাড়িয়ে সামনে যেতেই পা রাখলাম বালুকাময় কটকা বীচে! এটাকে জামতলা সী বীচও বলা হয়। এতক্ষণ হাঁটছিলাম সবুজের মাঝে! এবার এসে পড়লাম নীলের জগতে! অনাবিল খুশির ফোঁয়ারা যেন উপচে পড়ছে আমাদের চোখে-মুখে-মননে! সামনে দেখছি শুধু পানি আর পানি! পানি আর ঢেউ! কানে মন-বিহাগী রাগিণীর মত একটানা বেজে চলেছে কূলুকূলু ধ্বনির স্রোতের বীণা!

-"যেন রে প্রহর নাই, নাই কো প্রহরী!"

এতক্ষণ একটানা হেঁটে এসে অনেকেই পা ডুবিয়ে দিচ্ছে ঠান্ডা, স্নিগ্ধ জলে আর অনেকেই ছুটোছুটি করছে ক্যামেরা নিয়ে, আমাদের নিজেদের রূপের সাথে বীচের রূপের আহা কী মধুর মিলন যেনো!! তৃষিত চাতক-চাতকী যেন বরষার আকূল জলে স্নান করছে আর তৃষ্ণা মিটাচ্ছে!

সবার উদ্যম উচ্ছ্বাস দেখে ফরিদ স্যার বলে উঠলেন--

"আহ বাবা রা, এত্তো এত্তো ছবি তুলছো! তুলো! ছবি তুলতে ত আমাদের সময়কার মত টাকা গুণতে হচ্ছে না তোমাদের। "Just make a click- Your photo done". এই নীতিতেই চলো তোমরা!"

কটকা বীচে পড়েছিলো অসংখ্য gastropod, bivalve shell. আমরা মেয়েরা যে যত পারি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম বিভিন্ন রকমের খোলসগুলো!

সকাল- ১০ঃ৫৫। কটকা বীচ দেখা শেষ করে চলে এসেছি "কটকা অফিস সাইট" দেখতে। এটি

"কটকা অভয়ারণ্য " হিসেবেই সমাধিক পরিচিত।

কম-বেশি আমরা সবাই হরিণ দেখেছি। কিন্তু খোলা মাঠে, স্বাধীন পরিবেশে এক পাল হরিণের এমন অবাধে চড়ে বেড়ানোর দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম। নিজেদের মত গাছের পাতা খাচ্ছিলো তারা। হরিণদের সহজাত এই অপূর্ব মিলনমেলা এই প্রথম দেখা, হতে পারে এটাই শেষ দেখা!

হরিণের প্রজাতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চিত্রা হরিণ রা! হালকা বা গাঢ় বাদামি, কখনো কখনো হলুদ গায়ের রঙের সাথে সাদা সাদা গোলাকার ফোঁটা সারা গায়ে। এডাল্ট হরিণদের শিং তিন শাখা বিশিষ্ট। সুন্দরবনে একসাথে কয়েক শত হরিণের পালও দেখতে পাওয়া যায়।

৫০ এর দশকে হরিণের সংখ্যা কমলেও ১৯৭৩ সালে "বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন" বলবৎ করায় সাম্প্রতি হরিণের সংখ্যা বেড়েছে।

খালি পায়ে মধ্যদুপুর পর্যন্ত হেঁটে 'হিমুময়' ভা-ব নিয়ে ফেরত এসেছি জাহাজে৷ দুপুরের খাবারের জন্য ইয়া বড় বড় ফাইস্যা মাছ ভাজা করে রাখা আছে আমাদের সামনে। একটু একটু খাচ্ছি আর সামনের চেয়ারে বসা লাক্স এবং চ্যানেল আই এর সমন্বিত সুন্দরী ফাহিমা ইসরাত নুসবার নদীর উপর জাহাজে বসে দুপুরের খাবারকে

(পড়ুন" River-Sunlight lunch"!)

Candlelight dinner এর সাথে তুলনা করার প্রচেষ্টাগত থিওরী শুনছি!

এত এত হাঁটার পরও মজার মজার খাবার খেতে খেতে জলের নাচন দেখে মোটেও ক্লান্ত লাগছে না। কান পাতলেই যেন শুনতে পাচ্ছি --

"ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি

ছুটে হৃদয়ের ধারা।"

বিকাল-৪ঃ০০টা।

এসে পড়েছি আরেকটা স্পটে৷ শরণখোলা রেঞ্জ এর অধীনস্থ কোকিলমণি বা "কোকিলমণি টইল ফাঁড়ি"!

ট্রলার থেকে নেমেই দেখা পেলাম ইয়া বড় এক আমলকি গাছের। প্রচুর পরিমাণ বড় বড় আমলকি গাছ থেকে ঝুলছে। চাইলেই হাত টেনে ধরা যাবে এমন দূরত্বে। গাছের পাতার ভেতর আমলকিদের এভাবে ঝুলতে দেখে আমাদের ব্যাচের ভদ্র-ড্যাশিং ভাই নুরের Md Nurahad খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো কয়েকটা আমলকি পেরে নিতে! হানিফ ভাইয়ের অনাগ্রহের কারণে বেচারা আর আগাতে পারলো নাহ্।

আমলকি গাছের পাশেই একটি মিঠা পানির পুকুর৷ নামকরণ করা হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্মরণে।

অসংখ্য শাপলা ফুটি ফুটি করছিলো এই পুকুরটিতে! এত মনোরম দৃশ্য দেখে একটা ডিপি দেবার মত ছবি তুলেই ফেললো আমাদের মাকড়সাবিদ Sabbir Nur বাকিরা যে যার মত ছবি তুলতে মোটেও কাপর্ণ্য করলো না।

৫টা বাজতেই ট্রলারে বসে অপেক্ষার পালা শুরু হলো সবাই এসে বসার জন্য৷ পক্ষীবিদরা

(বিশেষ করে সর্পবিদFarhan Bappy,

হাঁটুনি Eshrat Jahan, আল আমিনসহ আরো কয়েকজন) ফরিদ স্যারের সাথে এখনো পাখি দেখছে!

আর তাদের জন্য নদীর ধারে ট্রলারে বসে আছি আমরা পাখি না চেনা জনতারা! হঠাৎ করে উপরে তাকাতেই দেখলাম নীড় ফেরা পাখিদের এক অপূর্ব গমন-দৃশ্য! কূজন করতে করতে অর্ধ চক্রাকারে নীড়ে ফেরত যাচ্ছে তারা! রাত যে ঘনিয়ে আসছে! বাড়ি যেতে হবে তো তাদের!

০৮.

"হে বিধাতা, তোমার প্রকৃতি অনন্য,

সূর্যাস্তের রক্তিম আভা গায়ে মেখে আমরা হলাম ধন্য!"

দ্বীপটির নাম তিনকোণা দ্বীপ, "Triangle Island "! কোকিলমণি থেকে ট্রলারে করে জাহাজে ফিরতি পথে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বীপটি। নেমে দেখার মত সুযোগ নেই বলে সবাইকে ট্রলার হতে দাঁড়িয়েই দেখতে হচ্ছে। ত্রিভুজের মত গঠনের মিশকালো সবুজে ছেয়ে আছে গাছপালার ঝোপ! দূর থেকেই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের! সূর্য অস্ত যাবার বেশি দেরি নেই! সবুজের সাথে সন্ধ্যার লালচে আঁধার মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে দ্বীপটির গায়ে! এ যেন অন্য কোনো জগত! অন্য কোনো দৈব আলো!! অন্য কোনো ভূবনে ঢুকে গেছি আমরা!! প্রকৃতি মাতার একি মূর্তি!!

--"চিৎকার শুনে বন্দুক হাতে টর্চ লাইট নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে গেলাম আমরা বাকি ৩ জন, কিন্তু ততক্ষণে বাঘে নিয়ে গেছে তরুণ ছেলেটিকে! সকালে তার ছিন্ন ভিন্ন লাশ উদ্ধার করি বনের ভেতর থেকে, তার বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করি! আমাদের তো আর কিছুই করার ছিলো না! "

১৯৯৯ সালের এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় একজন তরুণ ফরেস্ট অফিসারের সাথে ঘটে যাওয়া লোমহর্ষক কাহিনীর বর্ণনা দিচ্ছিলেন সুন্দর আলী আংকেল! এই গল্প শুনে ভয়ের শিহরণ বয়ে গেলো আমাদের শিরা-উপশিরায় .....

দ্বিতীয় দিনের ফিল্ড ওয়ার্ক শেষে রাতে সবাই আবারো জাহাজের ছাদে জড়ো হয়েছি। জলের সাথে জড়াজড়ি করে আসা হু--হু বাতাস আলতো করে আলিঙ্গন দিয়ে যাচ্ছে আমাদের। আমরা মেতে উঠেছি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়েজনে। তার এক ফাঁকেই আমাদের গল্প (সত্যি ঘটনা) বলছিলেন সুন্দর আলী আংকেল!

একে একে সবাই অংশ নিলো নাচ-গান- অভিনয় -গল্প -আড্ডায়! উল্লাসে মেতে উঠলাম সবাই!

#ভাবি_ভাবি" পার্ট-২ তে অপূর্ব অভিনয় দেখিয়ে আমাদের আনন্দকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিলেন আমাদের ব্যাচের দুজন অতি পারিচিত ভাবী ফারজু FaRzana YeSmin এবং নুপূর Nupur Akhter Nipa বিয়ে না করেও, কীভাবে ভাবি হবার গৌরব তারা অর্জন করে ফেলেছে সেটা বুঝার জন্য অবশ্যই তাদের অভিনয় দেখতে হবে সবাইকে!

এরপর মিস্টার বিনের ভূমিকায় দারুণ মূকাভিনয় করে দেখালো আমাদের ব্যাচের মেজবাহ উরফে কাইস্যা! স্বয়ং দুজন স্যার তার অভিনয় দেখে চমকে গিয়েছেন! আমরা সবাই তো হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিলাম তখন!

আমাদের ব্যাচের সর্ব গুণে গুণান্বিত একমাত্র বিজ্ঞানী'র Jahir Rayhan সুন্দরবন নিয়ে বানানো পুঁথিটির অসাধারণ উপস্থাপনের জন্য -ই সুন্দরবনে বসেই সুন্দরবনকে গভীর মমতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম আমরা! জায়গার স্বল্পতার জন্য পুঁথিটি এখানে যুক্ত করতে পারছি না!

এরপরে অনেকে নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি করেছিলো! সুন্দর আলী আংকেল এই রাতেই আমাদের দুটা গান শোনান, একটা গান আমি শুরুতেই লিখেছি, অন্য গানটা ছিলো আমাদেরকে আনন্দ দেবার জন্য!

--"তোর মনে ছিলো বন্ধু এত ছলনা

জানা ছিলো না রে আমার জানা ছিলো না!

চাইনি তো সোনা-দানা, মানিক-রতন,

চেয়ে ছিলাম শুধু একটা মনের মতন মন!"

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে প্রিয় ফরিদ স্যারের বলা কৌতুকটি আমি মিস করে ফেলেছিলাম যার আফসোস কোনোদিন যাবেনা!!

--"সবাই খেতে আসেন, ডাইনিং রেডি!" হানিফ ভাই ডাকতে আসতেই মজার সেই রাতটির ইতি টানতে হলো! ডিনারের জন্য নিচে যেতে হয়েছিলো সবাইকে!

**

গত দুইদিন বাঘ মামার দেখা মিলেনি! তাই আজ তৃতীয় এবং শেষ দিনে ভোরে উঠেই বেড়িয়ে পড়েছি বাঘ মামাদের থাকার জন্য বিখ্যাত একটা স্পটে, "হিরণপয়েন্ট" ...! কথিত আছে এই স্পটেই ঘনঘন দেখা মিলে বেঙ্গল টাইগারের!

(যদিও ভাগ্য সহায় ছিলো না বলে আমরা বাঘ মামার দেখা পাইনি সেদিন)

ভোর- ৬ঃ০০টা!

পৌঁছে গেছি সুন্দরবন পশ্চিম বনবিভাগের খুলনা জেলার "খুলনা রেঞ্জ " এর অধীনস্থ "নীলকমল অভয়ারণ্য" বা হিরণপয়েন্টে!

ট্রলার থেকে নামতেই গেইটের সামনে ইয়া বড় বড় দুইটা বাঘ দেখেই আমাদের চক্ষু চড়কগাছ!

.. নাহ্! না! এরা আসল না! নকল বাঘ! তাও

" নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো"! আমরা মনের সাধ মিটিয়ে ছবি তুলে নিলাম সিমেন্টে গড়া বাঘ মামাদের সাথে!

০৯.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন করেন নীলকমলে অবস্থিত সুন্দরবনের "বিশ্ব ঐতিহ্য ফলকটি" ফলকটিতে সংক্ষিপ্ত করে সুন্দরবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খোদাই করা আছে।

চারপাশে প্রচুর বাইন, গরান, গেওয়া, খইলশ্যা ইত্যাদি গাছদের রেখে কর্দমাক্ত চিকন একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে সামনে যাচ্ছি আমরা। এখানে রোদ পৌঁছায় না বলে বৃষ্টি হলে অনেকদিন কাদা থাকে! মেয়েদের হাঁটতে সমস্যা হচ্ছিলো বলে বিভিন্ন গাছপালার ঢাল হাত দিয়ে ভেঙে নিচে ফেলে চলার জন্য সুবিধা করে দিচ্ছিলেন হানিফ ভাইসহ বাকি দুইজন গাইড এবং আমাদের ব্যাচের ৩/৪ জন ছেলেরা।

বাইন, গরান, গেওয়া প্রভৃতি গাছগুলোর পাতা অত্যধিক পুরো বা মোটা! এর কারণ হলো এদের পত্ররন্ধ্রগুলো থাকে পাতার অনেক গভীরে যাতে তারা সরাসরি লবণ-পানির সংস্পর্শে না আসে। জোয়ার আসার ফলে পাতায় লবণ জমে বন্ধ হয়ে যেতে পারে পত্ররন্ধ্রের ক্রিয়া, মারা যেতে পারে গাছটি।

তাই তাদের এমন সতর্কতা! (তথ্য- Jahir Rayhan)

--"এই দেখো দেখো, বাঘের পায়ের ছাপ! " বলে সাপুড়ে Farhan Bappy যখন আমাদের সামনে তার মোবাইলটা তুলে ধরলো তখন আমাদের মাথার উপর কাঁঠাল গাছ (পড়ুন- বাইন গাছ) ভেঙে পড়লো যেনো!

কর্দমাক্ত চিকন পথটিতে লাইন ধরে হেঁটে আসতে আসতে আমরা এসে পড়েছি "Helipad" নামক পাকা মেঝের গোল একটা চত্তরে (Helicopter এখানে ল্যান্ড করে বলে জায়গাটার নাম হেলিপ্যাড)। আমরা সামনে যারা ছিলাম তারা আগে এসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম একটু। বাপ্পিরা পিছনে ছিলো, তাদের সাথে বনবিভাগের অন্য অফিসার গফুর আংকেল ছিলেন। আমরা প্রচুর হরিণের এবং অন্যান্য প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখলেও বাঘের পায়ের ছাপ দেখিনি। বাপ্পি যখন বললো গফুর আংকেলের সহায়তায় তারা বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছে এবং ছবিও তুলে নিয়ে এসেছে তখন আমরা হাহাকার করে উঠলাম। স্যাররাও আমাদের সাথে ছিলেন বলে দেখতে পারেননি!

(তাতে কী! ওনারা আগে অনেকবার দেখেছেন!)

যখন হেলিপ্যাডে অর্ধবৃত্তাকারে কাচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে "Group photo"তে 'pose' দিচ্ছিলাম তখন আমাদের কটাক্ষ করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো Asian Palmswift

(Cypriurus balasiensis) পাখিরা!

Apodidae পরিবারভুক্ত Insect খেকো এই পাখিদের ৭টি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যায়।

এটা অবশ্যই বলতে হয় যে ছবির মত সাজানো-গোছানো ছিলো হিরণপয়েন্ট জায়গাটি! কয়েকটি দালান ছিলো এখানে --" হিরণপয়েন্ট পাইলট বেইজ", "Mermaid" ইত্যাদি নামের।

সামনের দিকে কিছুদূর যেতেই দেখা মিললো "বাংলাদেশ নৌবাহিনী পয়েন্ট" এর। সুন্দরবনের মানচিত্র টা এখানে আঁকা ছিলো সুন্দরভাবে!

মানচিত্রটার পাশ ঘেঁষতেই-

"এখন জাদু দেখানো হবে, কারো সাথে দিয়াশলাই থাকলে বের করো" _বলে ডাক দিয়ে উঠলেন ফরিদ স্যার!

এরকম জায়গাতেও এক প্রাণিবিদের পকেট থেকে বের হলো দিয়াশলাই (নাম বলছিনা!)

নিচে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পানি বেরিয়ে আসার একটা চিকন নল দেখিয়ে স্যার নির্দেশ দিলেন একটা কাঠি জ্বালিয়ে পানির পাশে ধরতে। একজন এরকমটি করতেই ধুম করে পানিতে জ্বলে উঠলো আগুন! আসলেই তো জাদু! পানির স্রোতে আগুন।

একটুপর দেখা শেষ হলে স্যার সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন, নলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা পানিতে গ্যাস রয়েছে যার জন্য আগুনটা জ্বলে উঠলো। জাদু টাদু না!

বাঘ দেখা তো দূরে থাক বাঘের পায়ের ছাপও না দেখার হতাশাকে জলের ঢলে বিসর্জন দিয়ে সকাল-৯ঃ০০টা বাজতেই আমরা রওনা করতে চলেছি আরেকটি স্পটের উদ্দেশ্যে।

নাম- "দুবলার চর". জেলেদের ক্ষণস্থায়ী বসবাসের জন্য বিখ্যাত এই চরের অপর নামগুলো হলো "জেলে পল্লী" বা "শুটকী পল্লী"।

সুন্দর আলী আংকেলের দেয়া তথ্য মতে দুবলা নামক এক প্রকার ঘাস প্রচুর পরিমাণে জন্মায় বলে এই চরের নাম দুবলার চর।

বর্ষাকালে পানির নিচে থাকা এই চর জেগে উঠে শীতকালে। নভেম্বর মাসের শুরু হতেই সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, এমনকি চট্টগ্রাম থেকেও দলে দলে জেলেরা আসতে থাকে এখানে। তৈরি করে ক্ষণস্থায়ী ঘর-বাড়ি। নভেম্বরের ১১- ১৩ তারিখ পর্যন্ত বিশাল "রাস মেলা" হয় এখানে।

১০.

নভেম্বর - মার্চ; এই ৫ মাস জেলেরা বসতি গড়ে তোলে দুবলার চরে। সারা দিন- রাত ধরে তারা প্রচুর মাছ ধরে, এবং বিভিন্ন মাছগুলোকে শুকিয়ে শুঁটকিতে পরিণত করে। কৃত্রিমতা বর্জিত বলে এবং স্বাদ-গুণে শুঁটকিগুলোর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে সারা দেশে। দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখে শুঁটকি।

জেলেরা শুঁটকি বানিয়ে দেশের অর্থনীতির বাজারে অবদান রাখলেও তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি খুবই নাজুক, সভ্যতার আলো থেকে অনেক দূরে তাদের বাস।

দুবলার চরে বসবাসকারী জেলেদের মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয় প্রতিনিয়ত। বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপের কামড়ে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও তারা মাছ ধরে।

তাদের জন্য যে বাজারটি আছে তাতে প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সামগ্রী থাকলেও সাপের কামড়ের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। সাপের কামড়ে আক্রান্ত রোগীকে সরাসরি আনতে হয় খুলনায়, যোখানে বিদুৎ আছে, হাসপাতাল আছে।

দুবলার চর থেকে একটানা জাহাজে চড়ে খুলনায় আসতে সময় লাগে প্রায় ১২ ঘন্টা। ততক্ষণে আর বেঁচে উঠা সম্ভব হয়না কোনো সাপে-কাটা রোগীর!

"আলোরকল" নামক জায়গাটির অবস্থানও দুবলার চরে। এখানে রয়েছে একটা "Light House" যেটাতে রাতের বেলা আলো জ্বলে। অনেক দূর থেকে জাহাজে চড়া মানুষেরা এই আলো দেখে চরের কাছে এগিয়ে আসে। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে "আলোরকল"!

দুবলার চড়ে নামতেই আমাদের হাঁটু পর্যন্ত ভিজে গেলো অতিমাত্রায় শীতল পানির স্পর্শে। কিবরিয়া স্যার সবাইকে রোল অনুযায়ী আলাদা গ্রুপ করে দিলেন পরিদর্শনের সুবিধার্থে। আর প্রতি গ্রুপে গাইডের ভাইয়াদের থেকে একজন করে সঙ্গে দিলেন। আমাদের গ্রুপে আমাদের সাথে ছিলেন গাইড সাব্বির ভাই।

চরে আমরা যখন এলোপাথাড়ি হাঁটছিলাম তখন তিনি আমাদের বারবার নিচে দেখে হাঁটতে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন। একটু পরে বুঝতে পারলাম কেন তিনি বারবার এরকম বলছেন। আসলে জেলেরা মাছ ধরতে

এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে তাদের আলাদা করে শৌচাগার বানানোর সময় থাকেনা, তাই তারা চরের এখানে-সেখানেই কাজ সেরে ফেলেন! একটু বেখেয়াল হলেই আমাদের সংস্পর্শে এসে যেতে পারে সেসব বস্তু!

অতএব, সাবধান!!

চরে পড়ে থাকা একটা পেট-ফোলা মাছ দেখে সেদিকে দৌঁড়ে গেলে আমাদের ব্যাচের হাসির বাকশো Faria Farzana ।

তবে পটকা মাছটি মৃত দেখে সে হতাশ হলো।

জেলেদের জাল থেকে ফেলে দেয়া বিভিন্ন মৃত মাছ, সাপ, কাঁকড়া ইত্যাদি পড়ে ছিলো চরের

এখানে-সেখানে। যা দেখছি সব-ই প্রথমবার দেখছি, সব-ই নতুন লাগছে আমাদের। ছড়িয়ে থাকে এসব মাছদের বেশ ভালোভাবেই চিনেন সুন্দর আলী আংকেল এবং গাইডের ভাইয়ারা।

পাগলা বিজ্ঞানী জহিরার Jahir Rayhan বিচ্ছুর মত লাফালাফি আর কাকের মত ভাষণ সহ্য করতে না পেরে (যেহেতু সে আমাদের দলের ক্যাপ্টেন ছিলো) আমি দলছাড়া হয়ে ডায়েরী আর কলম হাতে সুন্দর আলী আংকেলের পিছন পিছন হাঁটছি। তাতে লাভ হচ্ছিলো বেশ। ওনি চরে পড়ে থাকা মাছগুলো দেখিয়ে ক্রমান্বয়ে নাম বলছিলেন আর আমি লিখে যাচ্ছিলাম দ্রুত। পাঠকের জানার জন্য নিচে কিছু নাম যুক্ত করছি....

#চিংড়ির_রূপভেদ_দেখুন-

চাকা চিংড়ি

চালি চিংড়ি

মটকা চিংড়ি

টাইগার চিংড়ি

কাঁঠালি চিংড়ি (এরা প্রত্যেকে কিন্তু আলাদা).!

এছাড়াও, শাপলা মাছ (শাপলার মত মাছটির বিষাক্ত কাঁটা আছে), বাঁশপাতা মাছ, পোমা মাছ, ছটা বাইল্যা, ছোলা মাছ, বৈরাগী মাছ, খাগড়া, ট্যাংরা, কইট্যা, মরমা, সিলেট বোল, নদীর কই, সাক্ষরখানা, মধু ফাইস্যা ইত্যাদি মাছের নাম আমি ডায়েরীতে লিখে নিলাম, চোখে দেখলেও মনে নেই!

আমরা দুবলার চরে গিয়েছি নভেম্বরের একদম শুরুতে, জেলেদের মাছ ধরে শুটকি বানানোর প্রক্রিয়া পুরোপুরি এখনো শুরু হয়নি, তাছাড়াও হরতালের কারণে বন্ধ ছিলো জেলেদের একমাত্র বাজারটি। অতএব, সুন্দরবনের সুন্দর গন্ধের শুটঁকি কিনতে না পেরে শুঁটকির গন্ধ নিয়েই জাহাজে আবারো ফেরত এসেছি সবাই।

"চট্টগ্রামে যে শুঁটকি পাওয়া যায় তার সাথে সুন্দরবনে পাওয়া শুঁটকির কোনো বর্ণ-গন্ধে কোনো মিল নেই"- বললেন ফরিদ স্যার।

কিবরিয়া স্যার সেই সাথে যুক্ত করলেন- চট্টগ্রামে শুটঁকি বানানোর সময় ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল। আমাদের ব্যাচের কক্সবাজারের আপু ইসরাত জাহান পাইজা শুঁটকির কৃত্রিমতার ব্যাপারে কিছুটা বলতেই কিবরিয়া স্যার বাকিটা বুঝিয়ে দিলেন।

দুবলার চর থেকে ফিরে আরেক প্রস্থ খেয়ে (প্রচুর খাওয়া-দাওয়া চলছে এখানে) সবাই সমবেত হলাম জাহাজের ছাদে।

আমরা চলে গিয়েছিলাম সুন্দরবন পশ্চিম বনবিভাগে। এখন আবার ফিরতে হবে আমাদের।। কিবরিয়া স্যার বলে রাখলেন ফিরে যাবার পথে সম্ভব হলে আরো একটা জেলে পল্লী দেখতে পারবো আমরা।

" স্যার, আমরা চবির প্রাণিবিদ্যা বিভাগ সুন্দরবনে একটা অস্থায়ী ক্যাম্পাস চাই!"

আমার পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে এই কথা বলে উঠলো স্বল্পভাষী সুমাইয়া Sumiya Tanjila l

সবাই ঘুরে তার দিকে তাকালো এই কথা শুনতেই। স্যার মুচকি হাসি দিলেন।

তুমুল করতালিতে কম্পিত হলো জাহাজের ছাদ।

আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে "অভিজ্ঞতা বর্ণনা" সেগমেন্টে অংশ নিচ্ছিলাম না বলে স্যার রোল ধরে সবাইকে কিছু না কিছু বলার জন্য নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

সুন্দরবনে কাটানো বিগত তিনদিন কেমন ছিলো সেটাই হলো বিষয়! প্রায় সবার বর্ণনায় উঠে আসলো খাবারের কথা!

আসলে জাহাজে খাবারের ব্যবস্থাপনা এতটাই সুখকর ছিলো যে কেউ আর বিরক্তিকর মেসে বিরক্তিকর খাবারের জায়গায় ফেরত আসতে চাচ্ছিলো না। সবাই খাবারের প্রশংসা- ই করে যাচ্ছিলো একে একে। কিন্তু সবার কথার শেষে বিষাদের সুর বাজছিলো। কারণ সুন্দরবনকে পেছনে রেখে আমরা নগর-সভ্যতার কাছে ফিরে যাচ্ছি, প্রকৃতির কোল থেকে প্রযুক্তির কোলে ফিরে যাচ্ছি আবারো! তাই বিষাদের বীণা বেজে চলছিলো সবার হৃদয়ে!

তিনদিনের ট্যুরে আমাদের সবার করা ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরলো আমাদের বর্তমান সিআর Shihar Newaj Shihar l তার সম্পর্কে পাঠকদের একটু জানানোর সুযোগ এটাই। এমন পরিশ্রমী, কর্মনিপুণ, নিষ্ঠাবান, সৎ, স্পষ্টবাদী, নরম মেজাজের ছেলে আমি আর দেখিনি বললেই চলে। এত এত সমস্যার মধ্যেও ভাইটি সিআরের সব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে। ক্রোমোজোম- ৪৬ তার কাছে এবং অন্যান্য সিআরদের (যারা পুরো ট্যুরকে সুন্দর করার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে) কাছে অনেক কৃতজ্ঞ থাকবে।

১১.

বিকাল- ৫ঃ১৫

সূর্য অস্ত যাবার কিছুটা দেরি আছে।

আমরা খুলনা অতিক্রম করে চলে এসেছি৷ সন্ধ্যা এখনো নামেনি বলে মিটিং ভেঙে ট্রলারে করে বেরিয়ে পড়েছি আরেকটি স্পট দেখার উদ্দেশ্যে,

যেটি একটি স্থায়ী জেলে পল্লী।

বাগেরহাটের চাঁদপাই রেঞ্জের "জয়মুনী জেলেপল্লী"!

সূর্যের লালচে আভা আকাশময় ছড়ানো এখনো। ট্রলার থেকে নেমে উচুঁ-নিচু, টিলাময় জায়গাটাতে যে যেভাবে পারি দাঁড়ালাম। সুন্দর আলী আংকেল তার পরিচিত এখানকার এক জেলের সাথে স্যারদের পরিচয় করিয়ে দিলে স্যার ওনার কাছে ওনার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এদিকে-সেদিকে কয়েকটি ভাঙাচোরা বেড়ার ঘর, মাটির ঘর, খড় দিয়ে বানানো ঘর ছিলো৷ স্যাঁতস্যাঁতে উঠোনের মত জায়গায় দুটো বড় বড় রাজ হাসঁ খাবার খুঁজছিলো নিজেদের মত। আমাদের দেখে বাচ্চাসহ কিছু মহিলা জড়ো হলেন ঘরের সামনে, জিজ্ঞেস করলেন আমরা খবরের লোক কিনা!

বাসায় বসে এই কাহিনী যখন লিখছি তখন জানিনা জয়মুনী জেলেপল্লীর মানুষদের কী হচ্ছে! জানিনা তাদের ঘর-বাড়ি আদৌ টিকে আছে কিনা!

সুন্দরবন থেকে আমরা চট্টগ্রামে চলে আসার দুইদিন পরেই বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড়

" বুলবুল" (০৯/১১/১৯- ১০/১১/১৯)। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে সুন্দরবন বুক পেতে সহ্য করে নিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত৷ সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলার প্রচুর কাচা বাড়ি ধ্বসে গেছে বুলবুলের তান্ডবে! জয়মুনী জেলেপল্লীর সেসব বাড়ি হয়তো আর নেই, হয়তো আর নেই দুবলার চরে জেলেদের বানানো ঘরগুলোও! জানিনা জেলেপাড়ার সেই মানুষদের কী করুণ অবস্থা এখন!

হায়রে সুন্দরবন! বাংলাদেশকে বুক দিয়ে আগলে রাখা এই সুন্দরবনকে রক্ষার তাগিদ এখনো আমরা অনুভব করছিনা! প্রতিনিয়ত নগরায়ন আর শিল্পায়নের পিছনে ছুটতে ছুটতে আমরা হারাতে যাচ্ছি বাংলাদেশকে ছেয়ে থাকা সুরক্ষার চাদর সুন্দরবনকে!

দীর্ঘ তিনদিন নেটওয়ার্কের বাহিরে ছিলাম আমরা, সুন্দরবনের ভেতরে কোনো অপারেটরের-ই নেটওয়ার্ক রেঞ্জ নেই৷ জয়মুনী থেকে ফেরত এসে জাহাজ চলতে চলতেই আমরা নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসলাম। সবার মোবাইলে একের পর এক কল আসতে থাকলো, পরিবার-পরিজনদের।

স্যারদের সাথে ছাদে মিটিং চলাকালীন-ই সবাই

মা-বাবার সাথে, বাড়ির লোকদের সাথে কথা বলছিলাম। সেই সাথে অর্ধ-সমাপ্ত মিটিং এর বাকিটুকুও সমাপ্তের দিকে এগুচ্ছে। সবার বক্তব্য শুনে শুনে স্যাররা এক্সকার্শনের জন্য বরাদ্দ থাকা মার্কিং সেরে নিচ্ছিলেন। খুলনা ৪নং ঘাটে পৌঁছানোর একটু আগে স্যাররা সমাপনী বক্তব্য দিলেন। কিবরিয়া স্যার আমাদের সাথে করা ট্যুরকে ওনার জীবনে করা সেরা ট্যুর বলে মিটিং শেষ করলেন৷ এই কথা শুনে সুন্দরবন থেকে চলে আসায় আমাদের মন বিষাদাক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও কিছুটা স্বস্তিদায়ক আনন্দ পেলাম।

আমাদের সবার ব্যাগপত্র আগে থেকেই গুছানো ছিলো। তাই ৪নং ঘাটে নামার আগে আগে আবারো জাহাজের ২য় তলার একপাশে বারান্দার মত সোফা বিছানো একটা জায়গায় আমরা মেয়েরা কয়েকজন জড়ো হলাম।

রাত-১০ঃ০০টা প্রায়!

হু..হু..হু বাতাস চারদিকে! অন্ধকারে জলের দিকে মুখ দিয়ে, দুই হাত দু'পাশে বাড়িয়ে দিতেই "Titanik" ওয়ালা অনুভূতি আসছিলো কারো কারো! জম্পেশ বইপোকা সাফা Saima Siddika Safa, সুন্দরীদের সুন্দরী Sadia Mehek , পারফেক্ট সিআর ফাইজা Blazing Nautilus ,লম্বুনি পুষ্প Aklima Soltana Pushpo সহ আমরা আরো কয়েকজন বসে শেষ গল্পটুকু করছিলাম। ক্যাম্পাসে ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে সুন্দরবনের গোলপাতারাও (Nypa fruticans) আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে বারবার! এসব কথার ভেতর কে জানি হুট করে আমার প্রিয়তম নজরুলের প্রসঙ্গ তুলে আমাকে ভড়কে দিলো! নজরুল কেনো তারঁ প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সে প্রশ্নের উত্তরে আমার দেয়া ব্যখ্যা কারোরই মনোপুতঃ হয়নি! কপট রাগ দেখিয়ে উঠে গিয়েছিলাম আমি!

৪নং ঘাটে জাহাজ ভিড়তেই সবাই নিচতলায় নেমে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম! বাস ধরার জন্য সবার সে কি তাড়া এখন!! ব্যস্ত নগরে বিদ্যুতের আলোর চকমকানি!

পিছনে ফেলে আসলাম সুন্দরী মা সুন্দরবনকে, একজন সুন্দর আলী আংকেলকে! সুন্দর আলী আংকেল জয়মুনী ক্রস করতেই নেমে গিয়েছিলেন। আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে ভুলেননি! দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে সুন্দরবনে চাকরি করে যাচ্ছেন সুদর্শন এই সুপুরুষ! সুন্দরবনে নেই বিদ্যুৎ-সংযোগ, নেই নেটওয়ার্ক-ব্যবস্থা! বউ-বাচ্চা থেকে, পরিবার-পরিজন থেকে, এক কথায় সভ্য সমাজ থেকে কত দূরে! তবুও দায়িত্বশীল, কাজের প্রতি অবহেলা নেই এতটুকু! সুন্দরবনের সাথে মিশে আছে তাঁর কত স্মৃতি, কত আবেগ, কত মায়া!

সুন্দরবনকে কত গভীরভাবে ভালোবাসলে এত ত্যাগ করা যায় ভাবতেই অবাক লাগে!

রাত-১০ঃ৩০

সবাই উঠে ঠিকভাবে বসার পর, গাইড ভাইয়াদের বিদায় দিয়ে বাস-১ এবং বাস-২ খুলনা থেকে রওনা দিলো! গন্তব্য প্রাণের শহর চট্টগ্রামে, মায়া হরিণের মায়া-লাগানো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।।

জানালার পাশের সীটে বসেই ব্যাগে করে নিয়ে যাওয়া মোটা চাদরটি বের করে জড়িয়ে নিলাম গায়ে!

স্নিগ্ধ, মৃদু বাতাস উড়ে আসছে খোলা জানালা দিয়ে! মনে হলো এই মাতাল-হাওয়া, ঐ স্বচ্ছ-জলের নাচন, শক্তিশালী সূর্যের উদয়- অস্ত সবকিছুকেই চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিলাম যেনো! চোখ বুজে ইচ্ছেমত উল্টে-পাল্টে দিতে লাগলাম Robert Frost এর কবিতার লাইনগুলোকে--

" I don't have any quarrel with the world,

And with my land's people -

I just want to show these beautiful scenario

to the masked criminals -

Who are destroying my country

who are destroying 'Sundarbans' !"

-সমাপ্ত।

-প্রমিলা নজরুল